প্রগতিশীল গবেষকরাও কেন এই ভুল করেন?

তৃতীয় মত

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

ভারতের একটি বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক মেইনস্ট্রিম পত্রিকার ৪ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছেন দীপেন্দর কুমার। তিনি নয়াদিল্লির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পিস স্টাডিজের রিসার্চ এসোসিয়েট। তার নিবন্ধটির নাম 'Where is Bangladesh Heading?' (বাংলাদেশ কোন পথে যাচ্ছে?) এই নিবন্ধটি পড়েও বাংলাদেশের সমস্যা অনুধাবনে তার নিকটতম প্রতিবেশী দেশটির সুশীল সমাজের একটি বড় অংশেরও সীমাবদ্ধতা এবং সমস্যার গভীরে প্রবেশের অক্ষমতা বুঝতে দেরি হয় না।

এই গবেষক ও প্রাবন্ধিক দীপেন্দর কুমার ঢাকার ২১ আগস্টের ঘটনাটির জন্য সরাসরি উগ্র মৌলবাদীদের দায়ী করেছেন এবং বাংলাদেশকে পশ্চিমা প্রচারণা অনুযায়ী একটি মডারেট ইসলামিক স্টেট ধরে নিয়ে তাকে মৌলবাদীরা শরিয়া স্টেটে পরিণত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। নিজের এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিবন্ধের শুরুতেই তিনি হরকাতুল জিহাদ-ই-ইসলামী নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম উল্লেখ করেছেন এবং ২০০২ সালে তাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ এবং শক্তিশালী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

তার মতে, "It was also reported that the Bangladesh intelligence agents have been maintaining close contact with their counter-parts in Pakistan's Inter Services Intelligence (ISI) for catering to the needs of those groups." 'সোজা কথায় বাংলাদেশের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের লোকেরা পাকিস্তানের আইএসআইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এবং তাদের লক্ষ্য সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের উদ্দেশ্য হাসিলে সাহায্য করা।' দীপেন্দর কুমার বর্তমান জোট সরকারের প্রধান মিত্র বলে জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের মতো মৌলবাদী সংস্থার নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ক্ষমতায় থাকার জন্য মৌলবাদীদের ওপর বিএনপির নির্ভরতা ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগেরও এদের সম্পর্কে দুর্বলতা মৌলবাদীদের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেছে।

এই সমস্যার সমাধান কি? দীপেন্দর কুমারের মতে, বাংলাদেশের সব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে দুটি পরিবারের বিরোধ। এই পরিবার দুটির একটি হচ্ছে শেখ মুজিবের পরিবার এবং অন্যটি হচ্ছে জেনারেল জিয়ার পরিবার। এই দুই পরিবারের প্রতিভূ হলেন শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া। এই দুই নেত্রীর বিরোধেই দেশটির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের দুর্দশার জন্য আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সমানভাবে দায়ী। দু'দলই ঘন ঘন হরতাল-বন্ধ ডেকে দেশের সোসিও-ইকোনমিক কন্ডিশন পঙ্গু করে দিয়েছে। সুতরাং দেশটিকে বাঁচাতে হলে উগ্র মৌলবাদীদের দমন করে গণতন্ত্রের সুরক্ষা করতে হলে আগে হাসিনা-খালেদাকে পারিবারিক বিরোধ মেটাতে হবে।

আমি নয়াদিল্লির মেইনস্ট্রিম কাগজে একজন ভারতীয় গবেষকের এই লেখাটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। কারণ উপরোল্লিখিত অভিমতটির প্রবক্তা ভারতের ডানপন্থী কাগজগুলো। তারাও বাংলাদেশের সমস্যা বিশ্লেষণে পশ্চিমা দেশগুলোর– বিশেষ করে তাদের শাসকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের চশমা ধার করে সবকিছু দেখেন এবং কথা বলেন। সে কথাগুলো বাংলাদেশের এত নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের কোন বামপন্থী মহলের মুখপত্রেও প্রতিধ্বনিত হতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি। তখন কিছুটা হতাশাবোধ করতে হয়। বাংলাদেশের সমস্যা অনুধাবনে ভারতের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের একাংশের মধ্যেও এই অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা আমাকে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন দুই-ই করেছে। কারণ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং সেক্যুলার সুশীল সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ভারতের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের নৈতিক সমর্থন ও সাহায্য একান্ত দরকার।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার একটি কারণ যে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বড় কারণ নয়। যারা বড় কারণগুলোকে আড়াল করতে চান, তারাই দুই নেত্রী বা দুই পরিবারের বিরোধটিকে বড় করে দেখান এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, এই দুই নেত্রীকে ঝেঁটিয়ে দেশ থেকে বিদায় করে দেয়া হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যমূলক মতের প্রবক্তা এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেনজির ভুট্টো আর নওয়াজ শরিফকে তো ঝেঁটিয়ে পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, তাতে পাকিস্তানের সমস্যা দূর হয়েছে কি? বন্ধু জবাব দেননি।

পারিবারিক প্রাধান্য এবং তা থেকে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত বহু দেশে ঘটেছে। তাতে সমস্যা দেখা দিয়েছে বৈকি। কিন্তু দেশটির সর্বনাশ হয়নি। কারণ, এই দ্বন্দ্ব ক্ষমতা দখলের গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রীলংকার মতো দেশেও বহুকাল জয়াবর্ধনে ও বন্দরনায়েক পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলেছে। তাতে দেশটি সংকটগ্রস্ত হয়নি। সংকট ও সন্ত্রাসকবলিত হয়েছে অন্য কারণে। ভারতে গান্ধী হত্যার পর নাথুরাম গডসে যদি ক্ষমতা দখল করত এবং ক্ষমতায় বসে গান্ধীকে নির্বংশ ও কংগ্রেস দলকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালাত এবং গান্ধী পরিবার দলের ও দেশের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামত, তাহলে মেইনস্ট্রিমের গবেষক কি তাকে দুই পরিবারের বিরোধ বলে ব্যাখ্যা দিতেন? বিলাতে ফক্স হান্টিং একদল নিষ্ঠুর শিকারির খেলা। হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শেয়ালগুলোকে হত্যা করা হয়। এই নির্মমতাকে কেউ যদি বলেন কুকুর ও শেয়ালের বিরোধ, তাহলে বলার কিছু থাকে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধকে দুই পরিবার বা দুই মহিলার বিরোধ বলে চালানো সমস্যাটির শিশুসুলভ সরলীকরণ অথবা সমস্যাটির বহুমাত্রিক চরিত্র বুঝতে অক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রিটেনসহ বহু দেশে দ্বিদলীয়, বহুদলীয় বিরোধ আছে। টোরি পার্টি ও লেবার পার্টির বিরোধ তো শতাব্দীকালের। কিন্তু এক দল ক্ষমতায় বসে যদি অন্য দলকে ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড দ্বারা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করত এবং বলে বেড়াত পঞ্চাশ বছরেও এই দলকে আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না তাহলে দীপেন্দর বাবুর মতো গবেষকরা কি তাকে দুই দলের বিরোধ বলে আখ্যা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন?

বাংলাদেশের এক নাক উঁচু 'নিরপেক্ষ' বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে টেলিফোনে সম্প্রতি কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, দেশে সন্ত্রাসের জন্য আপনি কেবল জোট সরকারের নিন্দা করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের শাসনামলে কি বড় বড় সন্ত্রাস হয়নি? হাসিনা পেরেছেন সেগুলো সামলাতে? সবিনয়ে বলেছি, না পারেননি। সে কথাই তো এই ২১ আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হমলার পরও ঢাকায় সরকার ঘেঁষা পত্রিকা ও কলামিস্টরা অনবরত লিখছেন। বলছেন, হাসিনা সরকারের আমলেও বড় বড় সন্ত্রাস ঘটেছে। এই কথা বলে জোট সরকারের আমলের সন্ত্রাসগুলো তারা ঢাকা দিতে চান।

বুদ্ধিজীবী বন্ধু বললেন, তারা অন্যায় কি করেছেন?

বলেছি, অসত্য কথা বলা, দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা একটি বড় অন্যায়। আপনি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিত। অভিধানে সন্ত্রাসবাদ ও রাজনৈতিক হত্যা (terrorism and political murder) কি একার্থবোধক?

বুদ্ধিজীবী জবাব দিলেন না। বললাম, হাসিনা সরকারের আমলে অবশ্য সন্ত্রাস হয়েছে। রাজনৈতিক হত্যা হয়নি। হাসিনা সরকারের আমলে বেছে বেছে বিরোধী মতের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা হয়নি, বর্তমান সরকারের আমলে যা অব্যাহতভাবে চলেছে। হাসিনা সরকারের আমলে যে সন্ত্রাস হয়েছে, যশোর থেকে রমনার বটমূল পর্যন্ত সবই উগ্র মৌলবাদীদের কাজ বলে তদন্তে আভাস পাওয়া গিয়েছিল। কনস্টেবলকে মসজিদে টেনে নিয়ে যারা হত্যা

করেছিল, তারাই এখন জোট সরকারের অন্যতম শরিক।
যা হোক, আমি দুই সরকারের আমলের তুলনা টানতে চাই না। শুধু বলতে চাই, হাসিনা সরকার সন্ত্রাস দমনে সফল হয়নি। কিন্তু ওই সরকারের আমলে অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলেনি। এই হত্যাকাণ্ডগুলোর অধিকাংশই মৌলবাদীদের কাজ বলেও আমি বিশ্বাস করি না। সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এক কথা নয়।
বুদ্ধিজীবী বন্ধু হাল ছাড়লেন না। বললেন, অনেকে তো বলছেন, এই বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ডগুলো আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র ভারতীয় 'র'-এর কাজ।
বলেছি, এটা নির্বোধের যুক্তি। আওয়ামী লীগই যদি সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক হত্যার পেছনে থাকবে, তাহলে বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাই মারা যাবে কেন? আর বিএনপি ও জামায়াতের একটা সভাতেও বোমা হামলা হল না কেন? আর ভারতীয় 'র'-এর গল্প? বাংলাদেশে আইএসআইয়ের দৌরাত্ম্য এত চরমে পৌঁছেছে যে, তাকে চাপা দেয়ার জন্য 'র'-এর গল্প আবিষ্কার করা হয়েছে। ভারত আমাদের অত বড় প্রতিবেশী দেশ। তার গোয়েন্দারা এদেশে নেই, তা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তারা আইএসআইয়ের মতো কতটা অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত, তা বর্তমান সরকারেরই তো জানা থাকার কথা। তারা তথ্য-প্রমাণসহ সে কথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছেন না কেন? কেবল বাঘ আসছে বাঘ আসছে বলে মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের মতো আর কতকাল চিৎকার দেয়া চলবে?
টেলিফোনের বিল বাড়ছে এই অজুহাতে বুদ্ধিজীবী বন্ধু আর কথা বাড়ালেন না। আমিও একটি কুযুক্তি এবং অসৎ প্রচারণার বারবার জবাব দেয়ার বিড়ম্বনা থেকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।
'মেইনস্ট্রিম' পত্রিকায় দীপেন্দর কুমারের নিবন্ধটি আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার বিরোধিতা করার জন্য অবশ্য লেখা নয়। বরং লেখাটি বাংলাদেশের আসল সমস্যা জানতে ও বুঝতে একজন প্রগতিশীল গবেষকেরও চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতাই প্রকাশ করেছে। সেই আলোচনাতেই তাই ফিরে যাই।
শুধু দীপেন্দর বাবু নন, পশ্চিমা প্রচারণার ধূম্রজালে পড়ে ভারতের সুশীল সমাজেরও একাংশ এখন বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশ একটি মডারেট ইসলামিক স্টেট। এই প্রেমিস থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে গেলে ভুল করা হবে। দীপেন্দর কুমারও সেই ভুলটি করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা একটি সেক্যুলার জাতি রাষ্ট্র হিসেবে। একটি গণযুদ্ধের দ্বারা এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সংবিধানে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়।
বাংলাদেশের এই সাংবিধানিক পরিচয় ও মর্যাদা দেশের মানুষের সম্মতিতে বা তাদের দ্বারা পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয়নি। বা পারিবারিক বিরোধ দ্বারাও সংবিধানের চরিত্রহানি হয়নি। কারণ রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির এবং রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জিয়া পরিবারের তখনও উত্থানই হয়নি। জেনারেল জিয়াউর রহমান তখনও নির্বাচিত মুজিব সরকারের অধীন একজন সামরিক অফিসার মাত্র। পরবর্তীকালে সামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা নির্বাচিত সরকারের উচ্ছেদ ঘটানো হয়। জিয়াউর রহমান ঘটনাক্রমে সামরিক শাসক হন এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য সামরিক ছাউনিতে বসে বিভিন্ন দলছুট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। সুতরাং বিএনপি সাধারণ অর্থে একটি ন্যাচারাল রাজনৈতিক দল নয়। বরং বলা চলে সামরিক শাসনের সিভিল ফেস।
জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় বসে সংসদ ও জনপ্রতিনিধিদের ডিঙিয়ে তার কলমের এক খোঁচায় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বদলে দেন এবং বিসমিল্লাহ্‌র সংযোজন ঘটান। অনেকে বলেন, দেশের পরাজিত সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলোর কাছ থেকে সমর্থন আদায় এবং সৌদি আরব ও পাকিস্তানের চাপে তিনি এই কাজটি করেন। পরে আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর তার অবৈধ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার স্বার্থে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে সেক্যুলার বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন। এরশাদের আমলে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর নাম করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয় এবং অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশ একটি মডারেট ইসলামিক রাষ্ট্র আর থাকেনি। পাকিস্তানের ঘোষিত অংশ না হওয়া সত্ত্বেও ওই দেশটির মতো একটি কমুনাল স্টেট বা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় ফতোয়াবাজি দ্বারা নারী নির্যাতন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বহির্বিশ্বে– এমনকি ভারতের সুশীল সমাজের বড় অংশও বাংলাদেশের এই অভ্যন্তরীণ চিত্রটি বুঝতে পারেনি অথবা বুঝতে চায়নি। তারা এটিকে মডারেট ইসলামিক স্টেট আখ্যা দিয়ে পশ্চিমী প্রচারণার চশমায় দেশটির সমস্যা বিচার করতে চেয়েছেন।
বাংলাদেশের সমস্যা তাই পারিবারিক বিরোধ বা দুই নেত্রীর বিরোধ থেকে জন্ম নেয়নি। দুই নেত্রীর রাজনীতিতে পা দেয়ার বহু আগে জন্ম নিয়েছে। বাংলাদেশের পরিচয়ের সমস্যা থেকে তার আজকের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। এখনকার মূল প্রশ্ন, বাংলাদেশ কি একটি ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে, না ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে? বাংলাদেশে কি উদার গণতান্ত্রিক সহনশীলতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা অনুসৃত হবে? না অসহিষ্ণু, অগণতান্ত্রিক ধর্মীয় (শরিয়া) শাসন প্রচলিত হবে? বাংলাদেশ তার চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ পর্যন্ত প্রবাহিত হাজার বছরের লোকায়ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহ্য দ্বারা লালিত হবে, না ধর্মীয় সংস্কৃতির নামে মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চাৎমুখী এবং অনুন্নত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ হবে? বাংলাদেশ কি ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কালচার দ্বারা পরিচালিত হবে, না পাকিস্তানের মতো গণবিরোধী সামরিক কালচারের দাসত্ব করবে?
বাংলাদেশের বর্তমান সংকটে সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের অভিশপ্ত থাবার যে সংক্রমণ, আমি সে আলোচনায় এখন যেতে চাই না। আমার কথা, দীপেন্দর বাবু যে বলেছেন, বাংলাদেশের আজকের সমস্যার মূলে রয়েছে দুই দলের, দুই মহিলার বিরোধ, তা রোগের উপসর্গ মাত্র, রোগ নয়। রোগ হল দেশটির পরিচয় ও অস্তিত্বের সমস্যার। আওয়ামী লীগ দল হিসেবে খারাপ হোক আর ভাল হোক, এই দলটি সেক্যুলার বাংলাদেশের, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, তার লোকজ সমাজ ও সংস্কৃতির রক্ষক। এই হিসেবে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তার তিন পুত্রেরও অবর্তমানে গৃহবধূ হাসিনাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় নেমে আসতে হয়েছে।
ভারতে দেশের নয়, কংগ্রেসের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে রাজীব গান্ধীর বিদেশী স্ত্রী সোনিয়াকে কংগ্রেসের নেত্রী পদে বসাতে হয়েছে। এটাকে সংঘ পরিবারের সঙ্গে গান্ধী পরিবারের বিরোধ বলে দীপেন্দর বাবু আখ্যা দিতে পারেন। কিংবা মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ ও আনোয়ার ইব্রাহিমের বিরোধকেও তিনি দু'জন পুরুষের বিরোধ বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে হাসিনা ও খালেদার বিরোধ পারিবারিক বিরোধের বাতাবরণে অনেক গভীরে প্রোথিত বিরোধ। হাসিনা এখানে সোনিয়া গান্ধীর মতো পরিবারের শত্রু ও দলের শত্রুর মোকাবেলা করছেন না। করছেন দেশটিকে প্রতিষ্ঠা করার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের শত্রু এবং তার লোকায়ত রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং এটি একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যুদ্ধ নয়, একটি অসম যুদ্ধ– অনেকটা ত্রিশের জার্মানিতে নাৎসি পার্টির সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিস্টদের অসম ও অসম সাহসিক যুদ্ধের মতো। দীপেন্দর বাবুরা প্রগতিশীল গবেষক হয়েও বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সত্যটা অনুধাবন করেননি, এটাই আমার দুঃখ।

লন্ডন ॥ ১২ আগস্ট রোববার ২০০৪ ॥

(আজ 'জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন কেন এবং কিভাবে'– এই প্রতিশ্রুতি লেখাটা লিখতে পারলাম না বলে দুঃখিত।)